তারিখ 14 Mar ... পৃষ্ঠা 5

# সরকারী কলেজের প্রশাসনিক উন্নয়ন-৩

## ডঃ আলী আহমেদ

আমার এ লেখায় ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, নির্ধারিত বিশেষজ্ঞ কমিটি বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে সরকারীভাবে একটি অ্যাফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে যুক্তিসঙ্গতভাবেই বর্জন করার পরামর্শ দিয়েছিল; তথাপি পুনরায় আজ এতদসংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়েছে। অবশ্য, আমরা এ ব্যাপারে প্রকৃত অগ্রগতি সম্বন্ধে বিশেষ অবগত নই। তবে, নিশ্চিতভাবে মনে হয় যে, এ ব্যবস্থা গ্রহণে উচ্চশিক্ষায় আমাদের মূল সমস্যার নিরসন হবে না। কারণ, এ দেশের কলেজগুলোর ডিগ্রী পরীক্ষা পরিচালনার এইটি উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন একটি বোর্ড হিসেবে কাজ করবে মাত্র।

যে গুরুতর সমস্যাদির কথা এই লেখায় আলোচনা করা হয়েছে, তার বাস্তবিক সমাধান করতে হলে দেশের সকল কলেজ পরিচালনা পদ্ধতি একই নীতিমালা অনুসারে হওয়া উচিত, যাতে উচ্চশিক্ষার মানের নিশ্চয়তা থাকবে। সুতরাং সকল কলেজই সরকারী কলেজরূপে গণ্য হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং এদের সংখ্যাও নিয়ন্ত্রিত থাকা উচিত। সমুদয় বাংলাদেশে ৫২৪টির অধিক কলেজ থাকার প্রয়োজন নেই। তার মধ্যে প্রতিটি উপজেলা সদরে কলেজ স্থাপনসহ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য সর্বমোট ৪৬০টি কলেজ এবং উচ্চতর ডিগ্রী শিক্ষার জন্য প্রতিটি জেলায় কলেজ স্থাপন সাপেক্ষে মোট ৬৪টি ডিগ্রী কলেজ থাকা উচিত। উচ্চ মাধ্যমিক কলেজগুলোর পাঠ্যবিষয়াদি ও অন্যান্য যা কিছু দেশের বিভাগীয় চারটি বোর্ড কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে। ডিগ্রী কলেজগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত হবে। দেশের প্রতিটি বিভাগে অন্ততঃ দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় থাকা প্রয়োজন; আর অতিরিক্ত একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (যা গাজীপুরে নির্মিত ভবন কমপ্লেক্সে ছিল) শরীয়ত সংক্রান্ত জ্ঞান বিস্তারের জন্যে অবশ্যই থাকা উচিত। এ স্থানে সাধারণ অন্যান্য সকল বিষয় যেমন-অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, গণপ্রশাসন, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি সহায়ক বিষয় পাঠের ব্যবস্থা থাকা উচিত যাতে করে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারীদের চাকুরীলাভে অসুবিধার সম্মুখীন না হতে হয়।

বিগত শাসনামলে খেয়ালের বশবর্তী হয়ে গাজীপুর থেকে কুষ্টিয়ায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তরে অর্থ ব্যয় বৃদ্ধি ছাড়া অপর কোন সুবিধা সৃষ্টি হয়নি। নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মাদ্রাসা শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রী কোর্সের অনুমোদন ও স্বীকৃতি দানের দায়িত্ব পালন করবে ও মাদ্রাসা বোর্ড নিম্নতর স্তরের মাদ্রাসা শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবে।

পূর্বে উল্লেখিত ৬৪টি ডিগ্রী কলেজের মধ্যে ৪৪টিতে ডিগ্রী (পাস) কোর্স চালু থাকবে; আর বর্তমান জেলাসমূহ গঠনের পূর্বে যে ২০টি প্রাক্তন জেলার আদর্শিক মানের ২০টি কলেজে উন্নত শিক্ষার সরকারী ব্যবস্থা ছিল, সেগুলোতে স্নাতক (সম্মান) ও মাস্টার্স ডিগ্রী কোর্স শিক্ষা পরিচালিত হবে। এগুলো বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ হিসেবে গণ্য হবে; এবং এগুলোর অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের অনুরূপ যোগ্যতা, পদমর্যাদা ও বেতন-ভাতা নিয়ে দায়িত্ব পালন করবেন। পরবর্তীতে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভের পর ধীরে ধীরে ঐগুলো ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ লাভ করতে পারে।

বর্তমানের নয়টি বিশ্ববিদ্যালয়, চৌষট্টিটি কলেজের পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ করাতে প্রতিটির আওতায় সাতটি কলেজ পড়ে। কাজেই আরও বিশটি বিশ্ববিদ্যালয় [illegible] হওয়ার পর প্রতিটির আওতায় মাত্র তিন-চারটি কলেজ থাকবে; যেমনটি অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটছে। এর ফলে উন্নতমানের শিক্ষা পরিচালনা নিশ্চিত হবে ও কলেজগুলোর সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের অসুবিধা দূর হবে। এই নূতন পরিকল্পনা গৃহীত হলে দীর্ঘকাল যাবত ডিগ্রী কলেজগুলোয় উচ্চ মাধ্যমিক শাখাকে ডিগ্রী শাখা থেকে পৃথকীকরণের যে অসুবিধা বিরাজ করছে এবং একই শিক্ষককে নিম্নতর স্তরসহ ডিগ্রী কোর্সেরও ক্লাস নিতে হচ্ছে বলে তাঁরা যে বিশেষজ্ঞরূপে মর্যাদাবান হওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন- এই অসুবিধাও দূর হবে। মাধ্যমিক কলেজ শিক্ষকগণের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানাহরণের সাথে পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি হবে। ডিগ্রী কোর্সের শিক্ষকগণ অধ্যাপক পদমর্যাদায় উন্নীত হবেন।

### ছাত্র ভর্তির নিয়ম

কলেজ শিক্ষার মান উপযুক্ত হওয়ার জন্য মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তির জন্য সকল ছাত্র-ছাত্রীকে ন্যূনতম ৫০% নম্বর নিয়ে মাধ্যমিক পাস হতে হবে, ডিগ্রী (পাস) কোর্সে ভর্তির জন্য উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ন্যূনতম ৫৫% নম্বর থাকা উচিত। ডিগ্রী (সম্মান) ও মাস্টার্স কোর্স প্রার্থীদের প্রকৌশল ও মেডিক্যাল প্রার্থীদের অনুরূপ অন্ততঃ ৬০% নম্বরের অধিকারী হওয়া উচিত। অবশিষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন কাজের বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণে প্রবৃত্ত হবে। বৃত্তি শিক্ষাকে হেয় করে দেখার কোন কারণ নেই। আধুনিক বিশ্বে সকল পেশাই মর্যাদাপূর্ণ ও সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকৃত। আশাপ্রদ মানসম্পন্ন সাধারণ শিক্ষার জন্য প্রতিটি উপজেলায় জনসংখ্যার চাহিদা বিচার করে সরকারী নির্দেশ সাপেক্ষে পৃথক অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে নির্দিষ্টসংখ্যক মাধ্যমিক স্কুল স্থাপিত হবে। মেধার ভিত্তিতে বিশেষ শিক্ষার সুযোগ থাকবে। বৃত্তি শিক্ষার প্রসার করতে হবে।

শুধুমাত্র সাধারণভাবে শিক্ষার অধিকারের শ্লোগান পরিবর্তন করে গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষার অধিকারের শ্লোগান প্রচার করতে হবে। উপার্জনের জন্য যে শিক্ষা তা জীবনমান উন্নয়ন ও জাতীয় উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।

### শিক্ষণ কৌশল

কলেজ শিক্ষকগণ বক্তৃতা-ভাষণ, ব্যবহারিক ক্লাস ও টিউটোরিয়াল ক্লাসের মাধ্যমে পাঠদান করেন। তাঁদের বক্তব্য সবসময় উন্নত, জ্ঞানসমৃদ্ধ ও সাম্প্রতিক অবস্থাভিত্তিক হয় না। এর জন্য পূর্বেই যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়ে ক্লাসে হাজির হওয়া উচিত। সুগভীর চিন্তাধারার ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশও থাকা উচিত। কিন্তু দেখা যায়, তাঁদের কাছে এ প্রত্যাশার প্রতিফলন মেলে না। একতরফা বক্তৃতায় ও পাঠদানের সার্থকতা থাকে না।

এ বিষয়ে শিক্ষকদের বক্তব্য হলো, কলেজ লাইব্রেরীতে প্রয়োজনীয় রেফারেন্স পুস্তকাদির অভাবে তাঁরা ক্লাসের বক্তৃতা অর্থপূর্ণভাবে হাজির করতে অপারগ হচ্ছেন। তাছাড়া, ছাত্র-ছাত্রীরা মূলতঃ নোট বই নির্ভর করে চলেও শুধুমাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার খাতিরে ক্লাসে উপস্থিত হয়; গভীর আলোচনায় তাদের উৎসাহ দেখা যায় না। অপরদিকে ভাল বই ইংরেজী ভাষায় লিখিত, কিন্তু পাঠদানের মাধ্যম বাংলা হওয়ায় এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ইংরেজী ভাষায় যথেষ্ট দখল না থাকায় ক্লাসের লেকচার শুধু নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক হয়ে থাকে।

শিক্ষকদের এ বক্তব্য একেবারে যুক্তিহীন বলা যায় না, তথাপি, কথা থাকে যে, তাঁরা সামান্য গবেষণার ক্লেশসাধ্য কাজেও আগ্রহী নন, প্রাপ্য বিষয়াদিও ব্যবহার করেন না এবং কোনক্রমে দায়সারাভাবে কাজ সমাধা করেই দায়িত্ব পালনে তাঁরা অভ্যস্ত। এ অবস্থার অন্তর্নিহিত কারণ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এবং তা হলো, শিক্ষকদের পদোন্নতি প্রদানের ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি অনুসরণ, যার দরুন শিক্ষকদের মধ্যে আগ্রহের অভাব ও নৈরাশ্য স্থায়ী হচ্ছে। এছাড়া বই-পুস্তকের কথায় বলতে হয় যে, উন্নত পুস্তক রচনা ও অনুবাদের ক্ষেত্রে তাঁদেরই অবদান রাখতে হবে।

ছাত্রদের পাঠ-সংক্রান্ত অসুবিধা জানা ও সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে টিউটোরিয়াল ক্লাস রয়েছে, যা স্বল্পসংখ্যক ছাত্রের প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগ দান ও সঠিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। সাধারণ ক্লাসে অধিকসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে যে সকল পাঠ সুস্পষ্ট হয় না তা সীমিতসংখ্যক ছাত্রের গ্রুপে ভালভাবে বোঝানো যায়। তাছাড়া এই ক্লাসে শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের কিছু হোম-টাস্ক বা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে ছাত্রদের লিখন-পঠন অভ্যাস গঠনে উদ্বুদ্ধ করেন। ছাত্রদের চিন্তা-ভাবনা বিকাশেরও সুযোগ ঘটে। কিন্তু, অধিকাংশ কলেজে যথেষ্ট শিক্ষকের অভাবহেতু এই পদ্ধতি কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হয় না। উপরন্তু, কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রেণীকক্ষের স্বল্পতা ও শিক্ষক সংখ্যার ঘাটতি উভয়ই এর জন্যে দায়ী। যে সকল কলেজে শিক্ষক ও শ্রেণীকক্ষের যথেষ্ট সুবিধা রয়েছে, সেখানেও দেখা যায়, বিশেষতঃ মানবিক ও বাণিজ্যিক বিষয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষক ও ছাত্রদের অধিকাংশই এই সকল টিউটোরিয়াল ক্লাস এড়িয়ে চলেন।

বিজ্ঞান শিক্ষার ক্লাসগুলোয় ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি সন্তোষজনক হলেও নূতনভাবে জাতীয়করণকৃত কলেজগুলোয় আধুনিক সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির অভাব, পরীক্ষাগারের স্থানাভাব ও অর্থাভাবসহ ব্যবহারিক কাজ পরিচালনার উপযুক্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাবহেতু শিক্ষার্থীরা ব্যবহারিক কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারছে না। প্রচারণায় বলা হয় যে, শিক্ষা খাতে বাজেট বৃদ্ধি হয়েছে; অথচ দেখা যায়, বাজেটের সিংহভাগই সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক ব্যয় মিটাতেই উবে যাচ্ছে; বেতন-ভাতা ছাড়া শিক্ষার মান উন্নয়নের বাস্তবিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টিতে ব্যয়ের জন্য যৎসামান্য অর্থই অবশিষ্ট থাকছে।

শিক্ষার্থীদের পাঠ গ্রহণ মূল্যায়নের জন্য নিয়মিত সাময়িক পরীক্ষার বিধি থাকলেও কিছুসংখ্যক ছাত্র ইদানীং পরীক্ষা বিমুখ হয়ে পড়েছে, যারা কোন প্রকার পরীক্ষায় বসতেই অনাগ্রহী। এরা বরাবরই কোন পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে চরমভাবে বিরোধিতা করে চলেছে। এরা অপরাপর ভাল ছাত্রদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণে বাধা দিচ্ছে। নিয়মিত প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা গ্রহণ শিক্ষা কোর্সের মেয়াদ শেষে পাবলিক পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ও এ সকল পরীক্ষার ফলে শিক্ষার্থীদের পাঠের মূল্যায়ন ও অগ্রগতি সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়ার সুযোগ থাকে। কিন্তু নিয়মিত সাময়িক, অর্ধবার্ষিক, প্রি-টেস্ট ও টেস্ট পরীক্ষা গ্রহণ সম্ভব না হলে পড়াশোনার মান যাচাই করাই সম্ভব হয় না। গোলযোগকারী ছাত্ররা মূলতঃ নিয়মিত পড়াশোনায় আগ্রহী নয়। কাজেই পরীক্ষার জন্য সময়মত প্রস্তুতি গ্রহণে এরা অপারগ হয়। এমনকি পরীক্ষায় বসলেও এরা অসদুপায় অবলম্বন করে; এ জন্য আন্দোলন করে ও সুযোগ দাবী করে। পরীক্ষায় অসাধুতা কলেজ শিক্ষার জন্য একটি দুষ্ট ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি পরীক্ষায় অসাধুতা রোধের আইন প্রবর্তন করেও এ ব্যাধি থেকে অব্যাহতি পাওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বরং পরীক্ষায় অসাধুতা অবলম্বনে বাধা দেয়ায় অনেক শিক্ষক লাঞ্ছিত, অপমানিত ও শারীরিকভাবে আক্রান্ত হয়েছেন। মফস্বল এলাকায় অনেক কলেজের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকগণ অবাঞ্ছিত গোলযোগ ও বিপদের আশংকায় ঝুঁকি নেন না, সন্ত্রাসের মুখে তাঁরা অসহায় বোধ করেন। রাজনৈতিক সন্ত্রাসের ব্যাপকতা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিস্তার লাভ করায় শিক্ষক ও পড়ুয়া ছাত্ররা সর্বদা ভীত থাকেন। সাধারণতঃ দুর্বিনীত আচরণের কাছে তাঁরা নতিস্বীকারে বাধ্য হন।

অপরদিকে, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এরূপ ছাত্র বিশৃংখলার মৌলিক কারণ বিচার ও অনুধাবন করার চেষ্টা না করে বরঞ্চ অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের উপর নির্দিধায় দোষারোপ করেন। ছাত্র পরিচালনায় সুকৌশল অবলম্বনে অপারগ বলে তাঁদের অক্ষমতাকে এ জন্য দায়ী করেন। সুনির্দিষ্ট ও ফলপ্রসূ দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণে কারও গরজ নেই। বিশৃংখলা ও সন্ত্রাস এতে সর্বত্র স্থায়ীভাবে আসন লাভ করছে।

দীর্ঘকাল এ ধরনের অসংযত ও শৃংখলাহীন শিক্ষা পরিস্থিতি বিরাজ করায় বিশিষ্ট কয়েকটি ছাড়া সকল সরকারী স্কুল-কলেজে শিক্ষার মান ভয়ানক হ্রাস পেয়েছে। এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার এই কথাই প্রমাণ করে। বিশেষ করে ডিগ্রী ও সাবসিডিয়ারী পরীক্ষায় অত্যন্ত নিম্ন ও পাস কোর্সে কোন কোন কলেজে একেবারে শূন্য পাসের হার নিতান্তই বেদনাদায়ক অবস্থা নির্দেশ করে। যতশীঘ্র এই বিপত্তিকর পরিস্থিতির কারণগুলো রোধের ও নিরসনের যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তৎপর হবে ততই দেশের জন্য তা মঙ্গল নিয়ে আসবে বলে আশা করা যায়। কারণ এই কথাটি স্মরণ রাখতে হবে যে, অত্যধিক নিম্নমানের এরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত অকেজো বিরাটসংখ্যক তরুণের এক অনুৎপাদনশীল জনগোষ্ঠী এ দেশের সমাজ জীবনে এখনই অত্যন্ত ভয়াবহ বোঝা হয়ে আছে। ওরাও দুর্বিষহ জীবনযাপন করছে। এই অশুভ প্রবাহ রোধ করতে হবে। গণতান্ত্রিক শাসনে সরকারের কাছে এটিই জনসাধারণের স্বাভাবিক প্রত্যাশা।

অনুবাদঃ কাওসার পারভিন

ডঃ আলী আহমেদঃ প্রাক্তন অধ্যক্ষ ঢাকা কলেজ, এমডিএস, পাকিস্তান এডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজ, লাহোর, বাংলাদেশ এডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজ/পিএটিসি, গবেষক, অনেক গবেষণা পুস্তকের প্রণেতা।